যুগান্তর

তারিখ 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরবে কে?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নামধারী সোনার ছেলেরা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর যেভাবে হামলা ও তাণ্ডব চালাল তা শুধু নিন্দার বিষয় নয়, একই সঙ্গে তা উদ্বেগজনকও বটে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে এবং শিক্ষার্থীদের দ্রুত হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়। এর মধ্য দিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন আবারও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। জামায়াত-বিএনপির লাগাতার হরতাল-অবরোধের কারণে দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে নেমে আসা সেশনজট নামক কালো ছায়ার আঁধার কাটতে না কাটতেই নতুন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে সেশনজটের কালো থাবা নেমে এলো। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও পুলিশের ন্যক্কারজনক এ হামলা থেকে সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিল ও বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও রেহাই পাননি। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সবারই এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, দেশের জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয় এবং শিক্ষাও কখনও পণ্য হতে পারে না। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করলে শিক্ষার মান-মর্যাদা আর থাকে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু এবারই সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর চেষ্টা করা হয়নি। কয়েক বছর আগেও সান্ধ্যকালীন কোর্স নামক বাণিজ্যিক কোর্স চালুর চেষ্টা করা হয়েছে। এ ধরনের কোর্স চালুর ক্ষেত্রে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকেরও মনোকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে। কারণ এতে রয়েছে কাঁচা টাকার গন্ধ। এ ধরনের কোর্স পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা প্রতি সেমিস্টারে বা বছরে মোটা অঙ্কের টাকার মুখ দেখতে পান আর এই কাঁচা টাকার লোভ অনেক শিক্ষকই সামলাতে পারেন না। গবেষণা চালালে দেখা যাবে, এ ধরনের সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর প্রকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়, বরং কাঁচা টাকা কামিয়ে দ্রুত আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াই শিক্ষকদের লক্ষ্য।

কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সান্ধ্যকালীন কোর্স পরিচালনা করা হয়, তাহলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। শিক্ষকরা কাঁচা টাকার পেছনে ছুটে বেড়ান সান্ধ্যকালীন কোর্সের পেছনে আর ক্ষতিগ্রস্ত হন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা। এখন সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর পক্ষের অনেক শিক্ষকই হয়তো বলবেন, তাহলে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হোক। কারণ বর্তমান বেতন-ভাতা দিয়ে এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে তাদের সংসার চালানো কঠিন। তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন, তখন কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকেরই নিয়োগপত্রে বেতন-ভাতার বিষয় উল্লেখ ছিল এবং আপনারা আগে থেকেই জানতেন বেতন-ভাতা কত হবে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায়, আপনারা ওই বেতন-ভাতা মেনে নিয়েই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন। তাহলে এখন কেন সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর পেছনে মরিয়া হয়ে উঠেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করছেন এবং শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছেন? এর দায় কি আপনারা নৈতিকভাবে কখনোই এড়াতে পারেন? প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের সান্ধ্যকালীন তথা বাণিজ্যিক কোর্স বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ ও পুলিশের সশস্ত্র হামলা চালানো এবং অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে আহত করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত কাজ? এ ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই নেতা-কর্মীকে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক বহিষ্কার করা হয়েছে, থানায় মামলাও হয়েছে অথচ সেখানে নাকি ছাত্রলীগের কারও নাম নেই! আবার ছাত্রলীগও মামলা দায়ের করেছে! ছাত্রলীগের মামলা দায়ের করার বিষয়টি হাস্যকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলার চেয়ে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলাকেই যে থানা-পুলিশ প্রশাসন বেশি গুরুত্ব দেবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত এ ধরনের বহিষ্কার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় লোকদেখানো বহিষ্কার এবং কিছু দিন পর তাদের 'ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন'র মতো আবারও সংগঠনে টেনে নেয়া হয় অথবা তারা তদবির করে সংগঠনে আবার স্থান পায়। তাছাড়া এ ধরনের বহিষ্কার করাই কি যথেষ্ট? তাদের কি ফৌজদারি আইনানুযায়ী শাস্তি হওয়া উচিত নয়? স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অবশ্য সম্প্রতি এক পত্রিকাকে বলেছেন, 'বিশ্বজিৎ হত্যার ঘটনায় সরকারের মাথা নিচু হয়েছিল আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় সরকারের নাক-কান কাটা গেছে।' তবে অবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দোষীদের শাস্তির আওতায় আনা না হলে আগামীতে সরকারের আরও অনেক কিছু কেটে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের গত পাঁচ বছরে অনেক অর্জন থাকলেও সেসবের অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে দেশব্যাপী ছাত্রলীগ নামধারীদের বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। এসব কর্মকাণ্ডের দায় মূলত সরকারের ঘাড়েই পড়ে। তাই বিষয়টিকে সরকারের অতি গুরুত্বসহকারে আমলে নেয়া উচিত।

থানায় মামলাও হয়েছে অথচ সেখানে নাকি ছাত্রলীগের কারও নাম নেই! আবার ছাত্রলীগও মামলা দায়ের করেছে! ছাত্রলীগের মামলা দায়ের করার বিষয়টি হাস্যকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলার চেয়ে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলাকেই যে থানা-পুলিশ প্রশাসন বেশি গুরুত্ব দেবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছরের ৩১ আগস্ট ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে যখন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সংগঠন করার পাশাপাশি

লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, ঠিক সেদিনই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে ১৩ জন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শতাধিক রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল ছোড়ে। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি ইতিপূর্বে অনেক এমপি-মন্ত্রীও ছাত্রলীগকে দেশ ও জাতি গঠনে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন, দিয়েছেন অনেক ভালো পরামর্শ এবং সর্বোপরি বারবার বলা হয়েছে নীতি আর আদর্শের কথা। কিন্তু কে শোনে কার কথা! প্রকৃত অবস্থা এই যে, কীভাবে লাখ লাখ টাকা কামাই করা যাবে, কীভাবে প্রভাব বিস্তার করা যাবে সেদিকে মন থাকায় এসব নীতিকথা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায়। দলের মূল নেতৃত্ব থেকে ছাত্রলীগের প্রতি এসব আহ্বান জানানো ও পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি ক্ষমতায় আসার পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে কেউ রেহাই পাবে না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামও এর আগে বলেছিলেন, 'ছাত্ররাজনীতির নামে গুণ্ডামি বন্ধ করতে হবে। এসব বন্ধ না করলে তিনি যে-ই হোন না কেন, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।' কিন্তু ছাত্রলীগের উদ্দেশে এতসব আহ্বান, পরামর্শ ও সতর্ক জারির ফলাফল যে শেষ পর্যন্ত শূন্যের কোঠায় গেছে এবং বর্তমানেও যাচ্ছে, তা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ দেশের নানা জায়গায় ছাত্রলীগ নামধারীদের 'কুকর্ম' তথা বাস্তব অবস্থা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। একেই বুঝি বলে, 'শুধু কথায় চিঁড়া ভিজে না'। আর এ ক্ষেত্রে সরকারের কথায় এবং কাজের মধ্যে যদি মিল না থাকে, তবে তা হবে জনগণের সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণা। তবে জনগণও যে এসব ক্ষেত্রে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো কাজ করতে যথেষ্ট সক্ষম, তা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দেশের সিটি করপোরেশনগুলোর নির্বাচনের ফলাফলই প্রমাণ করে। বিষয়টি সরকারের গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণে রাখা উচিত।

এর আগে ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'ছাত্রদল ও শিবিরের নেতাকর্মীরা ছাত্রলীগে ঢুকে পড়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তা হবে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বাঁধারই নামান্তর। আর এ ক্ষেত্রে ঘোগকে তাড়াতে নিশ্চয় বাঘকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাই নয় কি? আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের নিজেদের স্বার্থেই উচিত ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশকারী ছাত্রশিবির কিংবা ছাত্রদলের চর বা সুবিধাভোগীদের বাছাই করে ছাত্রলীগকে ঢেলে সাজানো।

পাঁচ বছর আগে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত ছাত্রলীগের বিভিন্ন অপতৎপরতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখতে দেখতে জনগণ রীতিমতো বিষিয়ে উঠেছে। তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ছাত্রলীগ কি অপ্রতিরোধ্য? ছাত্রলীগকে কি সামলানো সম্ভব নয়? আর যদি ছাত্রলীগকে সামলানো সম্ভবই হয়, তাহলে সামলানোর দায়িত্ব কার? সরকারের, নাকি অন্য কারও? ছাত্রলীগকে সামলানোর দায়িত্ব যদি প্রধানমন্ত্রী বা ছাত্রলীগের পিতৃসংগঠন কিংবা বর্তমান সরকারেরই হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের দ্বারা বারবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটলেও কেন তাদের সামলানো হচ্ছে না? কেন তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না? এ ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তাব্যক্তিরাই বা কী ভূমিকা পালন করছেন?

সরকারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেবে— এটাই সবার প্রত্যাশা। সর্বোপরি, এ কথা সবারই ভালোভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, দলের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ অর্থ উপার্জনসহ অবৈধ নানা সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পথ বন্ধ করা না হলে শুধু নীতিকথায় বা পরামর্শে কোনো কাজ হবে না।

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু : *বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস); অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য*
kekbabu@yahoo.com